দৈনিক বাংলা

13

তারিখ 15 MAY 1990
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

পরীক্ষা : ফাঁক আর ফাঁকি

এসএসসি পরীক্ষার তিন দিন অতিবাহিত হয়েছে। পরীক্ষা শুরুর আগে আমরা কিছু আশংকা প্রকাশ করেছিলাম। সেই সঙ্গে আন্তরিক প্রত্যাশাও ব্যক্ত করেছিলাম- আমাদের সমুদয় আশংকা মিথ্যা হয়ে যাক, শিক্ষাজীবনের অতি গুরুত্বপূর্ণ এ পরীক্ষাটি ভালোয় ভালোয় শেষ হোক।

বাস্তবতা প্রত্যাশার ধার ধারেনি।

পরীক্ষা শেষ হলে হয়ত আমাদের অনেকেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়বো- যাক, ভালোয় ভালোয় সব উতরে গেল। তবে সে হবে ব্যক্তিগত, বড় জোর গুটি কয়েকের উচ্চারণ। সমষ্টিগত সন্তোষ প্রকাশ করা যাবে না। প্রথম দুদিনের খবরেই নয় হাজারের বেশি শিক্ষার্থী নকলের দায়ে এবং জনাপঞ্চাশেক শিক্ষক পরীক্ষায় অসাধু তৎপরতায় সাহায্য করার দায়ে বহিষ্কৃত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

এটুকুই সব নয়। প্রথম দু দিনের আরো অনেক, বহিষ্কারের খবর এখনও আসছে। এদের মধ্যে ছাত্র যেমন আছেন, তেমনি শিক্ষকও রয়েছেন। এ ছাড়াও আছে কিছু হাঙ্গামা ও গ্রেফতারীর ঘটনা। এক কথায় বলা চলে শত সতর্কতা আর কঠোরতাও নকলবাজীর প্রবণতা রোধ করতে পারেনি।

এই প্রবণতা কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে তার কিছু নমুনা পত্রিকায় প্রকাশিত ছবিতেও ফুটে উঠেছে। এক জায়গায় দেখা গেছে জনা কয়েক সৌম্যদর্শন বয়স্ক মানুষ রাস্তার পাশে নকল সরবরাহের দোকান সাজিয়ে বসেছেন। অন্য একটি ছবিতে দেখা গেছে নকল সরবরাহের জন্যে একজন তরুণ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে টিকটিকির মত দ্বিতলের দেয়াল বেয়ে ওঠার চেষ্টা করছেন। এই সব সংঘবদ্ধ আর দুঃসাহসিক উদ্যোগকে কিসের আলামত গণ্য করা হবে?

দেশে এখন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পরীক্ষাও চলছে। তুলনামূলকভাবে পরিণত এই ডিগ্রী পরীক্ষার্থীদের দিকেও চোখ ফেরানো যায়। পরিস্থিতি ওখানে আরও ভয়াবহ। অবাধ নকলের অধিকার অক্ষুন্ন রাখার জন্যে ডিগ্রী পরীক্ষার্থীরা অনেক ক্ষেত্রেই মারমুখো। এই দাবী নিয়ে মিছিল করতে যেমন তাদের লজ্জা নেই, তেমনি বাধা এলে হামলা আর ভাঙচুরেও তারা কুণ্ঠিত নন।

অগ্রজ অনুজের চালচলনের ধারা গ্রামের লোকেরা একটা চমৎকার উপমায় প্রকাশ করে থাকেন। তা হচ্ছে এই- আগের হাল যেমন যায় পেছনের হালও তেমনি চলবে। অর্থাৎ চাষের সময় পেছনের বলদ তার পুরোগামীকেই অনুসরণ করে। সোজা কথায় অনুজেরা অগ্রজের পদাঙ্কই অনুসরণ করে চলে। এ দিক থেকে বিষয়টিকে দেখতে গেলে তরুণতর শিক্ষার্থীদের আমরা কি-ই বা বলতে পারি। অগ্রজেরা নকল করার সুযোগটাকে প্রায় পবিত্র অধিকার বলে মনে করতে শুরু করেছেন, শিক্ষক সমাজের একটি অংশ- তা যতই ক্ষুদ্র হোক এই ঘৃণ্য তৎপরতায় শরিক হতেও লজ্জিত বোধ করেন না এবং সমাজের বিভিন্ন স্তর আর বয়সের মানুষ নকলবাজীতে সাহায্য করায় এগিয়ে আসেন সেখানে বিদ্যালয়ের কচি কিশোরদের কতটা দায়ী করা চলে? পুরানো প্রবাদ দিয়েই আমাদের অবস্থাটা পরিস্ফুট করতে হয়, ভূত আজ সর্ষেতেই আশ্রয় নিয়েছে। ছাড়ানোর প্রক্রিয়া জটিল হতে বাধ্য।

পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে এই লজ্জাজনক পরিস্থিতিকে আমাদের শিক্ষাঙ্গনের স্বাভাবিক অবস্থা বলে মানতেও বাধে। আমাদের জীবনকালেই আমরা ভিন্ন অবস্থা দেখেছি। বছর কয়েক আগেও কোন শিক্ষক নকলবাজীতে সাহায্য করবেন এমন একটা অবস্থা ছিল অকল্পনীয়। নকল করে এমন ছেলের অভিভাবক হওয়াই ছিল চরম লজ্জার ব্যাপার, কোন অভিভাবকের পক্ষে তাই নকলবাজের পাশে দাঁড়ানোর প্রশ্নই আসতো না। হঠাৎ করে আজ এমনভাবে সব কিছু পালটে যাওয়ার কারণটা তলিয়ে দেখে এর প্রতিকার খোঁজা তাই প্রয়োজন।

বলা যেতে পারে মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটেছে। ভালো-মন্দ ন্যায়-অন্যায় বোধটাই ভোঁতা হয়ে গেছে। এর কিছুই অস্বীকার করছি না। তবু দেখতে হবে, এমনটা কেন ঘটেছে। আমরা তো জানি, শেষ লক্ষ্য এখনো সকল অবস্থায়ই শিক্ষা। তবু অশিক্ষা বা কুশিক্ষা কেন প্রাধান্য পায়? শিক্ষক-অভিভাবক কেমন করে মর্যাদার প্রতিষ্ঠিত পথ থেকে বিচ্যুত হন?

এসব জিজ্ঞাসার জবাব খোঁজা এক জটিল কর্ম। আমাদের তবু তা করতেই হবে। কেন না মুক্তির কোনো বিকল্প নেই এবং থাকতেও পারে না। সাধারণভাবে দেখতে গেলে প্রথমেই যা চোখে পড়ে তা হচ্ছে এই, যে মূল্যবোধের এমন ক্ষয় ঘটেছে যে ভালোয় আর মন্দে ফারাক করা দুষ্কর। তবে এ যুক্তি শিক্ষা ক্ষেত্রে অনাচারের রাজত্ব সমর্থন করার জন্যেও পর্যাপ্ত নয়। কেননা, সমাজ দেহের অনাচার-আবিলতা দূর করাই শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। ভালো আর মন্দের পার্থক্য নির্ণয়ের শক্তিই তো পাব শিক্ষা থেকে।

এ পর্যায়ে আসে শিক্ষার ব্যর্থতা প্রসঙ্গ। শিক্ষাঙ্গনে আজ অনাচারের যে ব্যাপক প্রতিষ্ঠা ঘটেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যর্থতার অভিযোগ উড়িয়ে দেয়ার নয়। এড়িয়ে যাওয়ারও না। এ ব্যর্থতাকে স্বীকার করে নিয়েই সার্থকতায় পথ খুঁজতে হবে।

শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান গলদ আজ বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন প্রায় নেই বললেই চলে। অথচ তীব্র প্রতিযোগিতার এ যুগে সনদ একটা চাইই। শিক্ষার্থী তাই পরীক্ষার হলে মরিয়া। শিক্ষকের পেশাগত অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে তার ছাত্রকে পাস করাতেই হবে- পঠন-পাঠনের বিকল্প অসদুপায়ে তাই তারও অনীহা নেই। কোণঠাসা অভিভাবক একই চাপে অনাচারের কাছে নতি স্বীকারে বাধ্য হয়েছেন। এই সত্যগুলো সামনে রেখে প্রতিকারের কথা ভাবতে হবে। আর তা যদি করা হয়, তখন সিদ্ধান্ত একটাই সামনে এসে দাঁড়ায়- শ্রেণী কক্ষে পঠন-পাঠনের অভ্যাস ফিরিয়ে আনতে হবে। তেমন একটা অবস্থায়ই একজন শিক্ষক কিংবা অভিভাবকের মাঝে বিবেকের শাসন ফিরে আসতে পারে।

এই সমাধানটি বলতে সহজ হলেও বাস্তবায়নে যেমন কঠিন, তেমনি সময় সাপেক্ষ। বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠনের পরিবেশ বা অভ্যাস লক্ষ্য হিসাবে কখনও পরিত্যক্ত হয়নি। হয়েছে এই, একটা একটা গা-ছাড়া মনোভাব নিয়ে আমরা এর অনুপস্থিতিটাকে একটি অকথিত স্বীকৃতি দিয়ে বসেছি। এ অবস্থাটা পাল্টানোও সহজ কথা নয়। এ দিকেই মন ফেরাতে হবে।

কিছুই যে হচ্ছে না এমনও নয়। এসএসসি পরীক্ষায় অনাচারের দু দিনের পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে রাজধানী নগরী এবং দেশের বড় শহরগুলোতে গোলযোগের পরিমাণ কম। এর কারণও দুর্বোধ্য কিছু না। এই সব বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা পড়াশুনার কিছু সুযোগ অন্তত পেতে শুরু করেছে। পরীক্ষায় কড়াকড়ি প্রবর্তনের ফলে কিছু সংখ্যক বিদ্যালয়ে পড়াশুনা ফিরে এসেছে কিংবা অভিভাবকেরা বিশেষ ব্যবস্থায় তাদের সন্তানদের কিছুটা হলেও পড়তে বাধ্য করছেন। অসদুপায় অবলম্বনের গরজ তাই এসব এলাকায় হ্রাস পেয়েছে।

বড় শহরগুলোর অবস্থার এই উন্নতিকে কিন্তু সন্তোষের বিষয় বলে গণ্য করা যাবে না, যতক্ষণ না সারা দেশে অনুরূপ অবস্থার বিস্তার ঘটছে। কেন না এই উন্নতি আরেকটি সমস্যার জন্ম দিয়ে যাচ্ছে। এক ও অভিন্ন বলে প্রবর্তিত মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যাপক বৈষম্যের সৃষ্টি করে চলেছে। একই শ্রেণীতে পাস করা গ্রাম আর শহরের দুজন শিক্ষার্থীর দিকে নজর দেয়াই এ বৈষম্যের স্বরূপ অনুধাবনের জন্যে পর্যাপ্ত। এই বৈষম্য আজ উচ্চ সাফল্যকে হাতেগোণা কয়েকটি বিদ্যালয়ের একচেটিয়া অধিকারে পরিণত করেছে। এ ধরনের বৈষম্যও অসম প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করে অসদুপায়কেই উৎসাহিত করে। বিশেষ বিদ্যালয়ের চেয়ে তাই সকল বিদ্যালয়কে বিশেষ মানে নিয়ে আসা আমাদের বড় প্রয়োজন।

প্রকৃত শিক্ষণ আর পরীক্ষার মানে সমতা বিধানের উদ্যোগ নিলে অসদুপায়ের চাপ হ্রাস পাবে। হারানো মূল্যবোধ ফিরিয়ে আনা তখনই সম্ভব হতে পারে।

তবে এ সবই তো সময় সাপেক্ষ পদক্ষেপ। এই সব লক্ষ্য সামনে রেখে আপাতত কি হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হবে? না, তেমন কথা আমরা বলবো না। অন্তবর্তী ব্যবস্থা হিসেবে কড়াকড়ির বিকল্প নেই। কর্তৃপক্ষ পরীক্ষায় অসদুপায় বন্ধ করার লক্ষ্যে যে কঠোরতার নীতি অবলম্বন করেছেন, তার প্রয়োগ আরো নিশ্ছিদ্র করে তোলা আবশ্যক। সাময়িক সুফল অন্তত কিছুটা হলেও আসবে এর থেকে। আমাদের সন্তানদের গোটা জীবনের প্রস্তুতিতে কোন ফাঁক বা ফাঁকি থেকে যাবে, এ কারো কাম্য হতে পারে না। যে মূল্যেই হোক, এই অশুভ প্রবণতা তাই আমাদের রুখতেই হবে।

—সালেহ চৌধুরী

দৈনিক বাংলা

তারিখ 29 MAY 1990
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

যে সব কলেজ থেকে কেউ পাস করে না

গত বছর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিকম পরীক্ষায় ২০টি কলেজ থেকে কেউ উত্তীর্ণ হতে পারেনি বলে খবর প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া একটি কলেজের ৫৩ জন পরীক্ষার্থীর সকলকেই অসদুপায় অবলম্বন করার দায়ে অভিযুক্ত করা হয়েছে। ফলে তাদেরও কেউ উত্তীর্ণ হয়নি। শুধু যে বিকম পরীক্ষায়ই ২০টি কলেজ থেকে কেউ উত্তীর্ণ হতে পারেনি, তাই নয়। বিএ, বিএসসি পরীক্ষায় কেউ উত্তীর্ণ হতে পারে না, এমন কলেজেরও অভাব নেই। আর শুধু চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বলেই নয়, দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও এ ধরনের ঘটনা ঘটে। কেউই উত্তীর্ণ হতে পারে না বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ অনেক কলেজ থেকে। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, যে নব কলেজ থেকে কেউ উত্তীর্ণ হতে পারে না, তার প্রায় সবই মফস্বলে অবস্থিত। আমরা লক্ষ্য করি, প্রত্যেক পরীক্ষার ফল বেরোবার পরপরই এ ধরনের কলেজের একটা তালিকা প্রকাশিত হয়, যেখান থেকে কেউ পাস করেনি।

এ ছাড়া শুধু কলেজের কথাই নয়, বহু মাধ্যমিক স্কুলেও ঘটে এ ধরনের ঘটনা। শত শত ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষা দিলেও উত্তীর্ণ হয় সামান্যই, কিংবা কেউই উত্তীর্ণ হয় না।

কিন্তু অব্যাহতভাবে কি করে এ ধরনের ঘটনা ঘটতে থাকে, সে এক প্রশ্ন। সরকার স্কুল- কলেজের শিক্ষকদের বেতনের এক বিরাট অংশ বহন করেন। কিন্তু এ সব অর্থের সবটুকু উপযুক্ত ফল দিচ্ছে কিনা, তা বোধ হয় খতিয়ে দেখা হয় না। কিন্তু এসব স্কুল-কলেজে প্রদত্ত অর্থ শিক্ষা বিস্তারে কতটুকু সহায়তা করছে তা ভেবে দেখা প্রয়োজন। প্রয়োজন জবাবদিহির সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা।

একথা স্পষ্ট যে, যেসব স্কুল কলেজ থেকে কেউ পাস করতে পারে না, সেখানে লেখাপড়ার মান অতি নিম্ন। কিন্তু কেন এই অবস্থা অব্যাহত থাকবে? আমরা প্রশ্ন করতে চাই, সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা কি তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেছেন? তারা কি ছাত্রদের শিক্ষাদানের জন্য, পরীক্ষায় পাসের উপযোগী করে করা দরকার তার সব কিছু করেছেন? তারা কি পাঠদানে যথাযথ মনোযোগী ছিলেন? তারা কি সময়ে সময়ে পরীক্ষা করে দেখেছেন যে তাদের ছাত্ররা উত্তীর্ণ হবার যোগ্য হল কিনা? বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল থেকে বোঝা যায়, তারা তাদের সেই পবিত্র দায়িত্ব পালন করেননি।

তবে একথাও সত্য যে, নানা ধরনের গোলযোগে অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ থাকে না। শিক্ষকরা সে অবস্থার শিকার হন। কিন্তু তা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরাও তাদের দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারবেন না।

এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যলয় কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এসব কলেজের শিক্ষা পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজ-খবরের ব্যবস্থা করতে পারেন। কোন কলেজে ঠিকমত লেখাপড়া হচ্ছে কিনা, ওই কলেজে থেকে সত্যি কেউ স্নাতক পর্যায়ে পরীক্ষা দেবার যোগ্য কিনা, তা আগাম পরীক্ষার একটি ব্যবস্থা দরকার। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কলেজগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণেরও নিয়ম থাকা দরকার।

এ দিকে পড়ালেখার মানের এই অবস্থার জন্য দেশে নকল প্রবণতা দুরারোগ্য ব্যাধির মত জেঁকে বসেছে। যে কোন পরীক্ষায়ই তাই দেখা যায় হাজার হাজার পরীক্ষার্থী বহিস্কৃত হচ্ছে। অনকে ক্ষেত্রে নকল সরবরাহের দায়িত্ব নেয় শিক্ষকরাও, তারাও বহিষ্কৃত হয় পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে। এ অবস্থা শিক্ষক সমাজের জন্য কলঙ্ক বয়ে আনে। ছাত্রদের উপযুক্ত শিক্ষা দিতে ব্যর্থ হয়েই অনেক শিক্ষক নকল সরবরাহের মত কাজে যোগ দেন।

এ দিকে নকল প্রতিরোধের জন্য গৃহীত ব্যবস্থা শহরাঞ্চলে যতটা কার্যকর হয়েছে, অন্যত্র ততটা কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। ফলে শহর থেকে দূরের কেন্দ্রগুলিতে দেদার নকল হয়। তা হোক না এসএসসি, এইচএসসি কিংবা স্নাতক পর্যায়ের যে-কোন পরীক্ষা। নকলের দাবীতে এখন মফস্বলের কেন্দ্রগুলোতে রীতিমত মিছিল হয়, হাঙ্গামা হয়। নকলের অধিকার না পেয়ে পরীক্ষা বর্জন করে তথাকথিত ছাত্ররা।

কিন্তু আর কত কাল? এই অবস্থার একটা সুরাহা হওয়া দরকার। আমরা মনে করি, এ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এক একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রতিবছর সরকারকে বিপুল অঙ্কের অর্থ ব্যয় করতে হয়। শিক্ষকদের বেতনের বিরাট অংশ বহন করেন সরকার। বেতনের নামমাত্র অংশ বেসরকারী স্কুল-কলেজগুলো বহন করে। তাই বেসরকারী শিক্ষার মানোন্নয়ন সম্পর্কে সরকারের দায়িত্ব রয়েছে। যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা ব্যাপকহারে নকলের আশ্রয় নেয়, যে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা-র্থীদের পাসের হার সন্তোষজনক নয়, সেগুলোর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার কথা চিন্তা করা দরকার। এ সম্পর্কে বোর্ড-বিশ্ববিদ্যালয়-সরকার সকলকেই সমন্বিত ব্যবস্থা নিতে হবে বলে মনে করি।

—দর্শক